বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ৯১-১২০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বঙ্গবন্ধু-দর্শন: তত্ত্ব, প্রয়োগ ও সম্ভাবনা

আবুল বারকাত*

১. ভূমিকা

বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য শিরোনামেই স্ব-ব্যাখ্যায়িত। শিরোনাম হলো "বঙ্গবন্ধু-দর্শন: তত্ত্ব, প্রয়োগ ও সম্ভাবনা" (Philosophy of Bangabandhu: Theory, application and possibilities)। স্বচ্ছতার খাতিরে বলে রাখা দরকার যে এর আগেও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্লাটফর্মে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে "মূল প্রবন্ধ" উপস্থাপন করেছিলাম, যার শিরোনাম ছিল "বঙ্গবন্ধু-দর্শন": তত্ত্ব, প্রয়োগ ও "উচ্ছেদিত সম্ভাবনা"। এ নিয়ে বলেছিলাম ২০১৯ সালে খুলনা ও দিনাজপুরে আঞ্চলিক সেমিনারে আর পরে ২০২০ সালে কুষ্টিয়া ও রাজশাহীর আঞ্চলিক সেমিনারে। এসব সেমিনারে সুধীজন আমাকে যেসব চিন্তা উদ্রেগকারী প্রশ্ন করেছিলেন, উপরি হিসেবে সেসব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর দেবার প্রয়াসটাও আজকের বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতায় থাকবে। তার আগে শুরুতেই উত্থাপিত প্রশ্নগুলো বলে নেওয়া সমীচীন। প্রশ্নগুলো এ রকম:

(১) বঙ্গবন্ধু দার্শনিক ছিলেন কি'না? (এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দিয়েছি)।

(২) "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" বলতে আমি যা বুঝি ও বুঝায়, সেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন (বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি), রাজনৈতিক দর্শন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন দর্শনের যে অধীনস্থক্রম দেখায়—কাঠামোটা কত দূর যৌক্তিক? (এ প্রশ্নেরও সম্ভাব্য উত্তর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দিয়েছি)।

(৩) "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অবিচ্ছেদ্য সুপ্ত সম্ভাবনা নির্মূল করতেই ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়—আমার এ বক্তব্যটি কতদূর সঠিক? (সম্ভবত নির্মোহ ইতিহাসকেই আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি হিসেবে দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন কার্যকরণ দিয়ে আমি তা দেখানোর চেষ্টা করেছি)।

(৪) ১৯৭২-৭৫ কালপর্বে বঙ্গবন্ধু দেশ পরিচালনায় যা করেছিলেন, তা'কি "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর বিশেষত তাঁর রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক দর্শনকে যথেষ্ট মাত্রায় প্রতিফলিত করে কি? (আমার উত্তর ইতিবাচক, যা তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলার চেষ্টা করেছি)।

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)। সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

(৫) বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন এবং বঙ্গবন্ধু-দর্শন যদি বাস্তবে প্রয়োগ হতো সেক্ষেত্রে দেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিগত যে রূপান্তর হিসেবপত্তর করে দেখানোর চেষ্টা করেছি তা বাস্তবে হতো কি'না? (এ প্রশ্নে আমার উত্তরটা যথেষ্ট নির্দেশনামূলক-ইঙ্গিতবহ। হুবহু হিসেবপত্তর কেমন হতো তা বলা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বঙ্গবন্ধুসহ বাংলাদেশ হতো স্বল্পবৈষম্যপূর্ণ আলোকিত মানুষের এক সমাজ। এসবই চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলেছি)।

(৬) ১৯৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশে যে ধরনের উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যা বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী—সেখানে বঙ্গবন্ধুর আর্থসামাজিক উন্নয়ন দর্শনের ছোটখাটো প্রয়োগ সম্ভব কি'না? (প্রশ্নটা সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরটা এ রকম—"চেষ্টা করতে অসুবিধা কোথায়"; সমাজদেহে অনেক ধরনের ইতিবাচক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তুলনামূলক ভালো ফল দিতে পারে। বিষয়টি "উপসংহারিক" বক্তব্যে উপস্থাপন করেছি)।

আজকের বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতায় থাকছে পরস্পরসম্পর্কিত পাঁচটি অনুচ্ছেদ। 'ভূমিকা'র পরের অনুচ্ছেদসমূহ যথাক্রমে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—সারকথা ও বিনির্মাণপ্রক্রিয়া (২য় অনুচ্ছেদ), "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—প্রারম্ভিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ফল (৩য় অনুচ্ছেদ), "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—পূর্ণ বাস্তবায়নে সমাজকাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনটা কেমন হতো (৪র্থ অনুচ্ছেদ)?" এবং "উপসংহার" (৫ম অনুচ্ছেদ)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলতে চেষ্টা করেছি "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" বলতে আমি কী বুঝি এবং ঐ দর্শন কীভাবে, কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে, কোন রাজনৈতিক ভাবনাপ্রক্রিয়ায় বিনির্মিত হলো। তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলতে চেষ্টা করেছি "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" যদি তত্ত্ব-কাঠামো হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রয়োগ হলো কীভাবে এবং প্রয়োগফলই বা কী—যদিও ঐতিহাসিকভাবেই প্রয়োগটা ছিল প্রারম্ভিক স্তরের এবং ক্ষণস্থায়ী। আর চতুর্থ অনুচ্ছেদে দেখাতে চেয়েছি যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি কিন্তু যদি তা হতো, তাহলে তার প্রভাব-অভিঘাতটা আমাদের সমাজকাঠামোর ওপর কেমন হতে পারতো, এবং এ অনুচ্ছেদেই বুঝতে ও বুঝাতে চেয়েছি যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে আমরা হারিয়েছি কল্পনাতীত সম্ভাবনা ("unimaginable lost possibilities") অথবা বলা চলে নির্মূল-উচ্ছেদ ('eradication' অর্থে) করা হয়েছে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রায়োগিক সম্ভাবনা এবং একইসাথে বলতে চেষ্টা করেছি যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অন্তঃস্থিত ঐ সুপ্ত সম্ভাবনা নির্মূল-উচ্ছেদের কারণেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যার শিকার হতে হয়েছে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ—"উপসংহার"-এ বলার চেষ্টা করেছি যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন' বাস্তবায়নের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোটিই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে; সৃষ্টি হয়েছে নিও-লিবারেল মুক্তবাজার দর্শনের আওতায় লুটেরা-পরজীবী পুঁজিবাদ, যা বৈষম্য উৎপাদন-পুনরুৎপাদন করে চলেছে।

উপসংহারে এ কথাও বলার চেষ্টা করেছি যে এমনকি লুটেরা-পরজীবী পুঁজিবাদী প্রতিকূল কাঠামোর মধ্যেও "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অবিচ্ছেদ্য অন্তত ৩টি সুনির্দিষ্ট বিষয় বাস্তবায়ন বিবেচনা করা যেতে পারে: (১) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে উচ্চতর গুণমানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, (২) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, (৩) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে 'কৃষি-সমবায়' গঠন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি বিগত ১০-১৫ বছরে ইতোমধ্যে কয়েক দফা লিখেছি, বক্তব্য দিয়েছি। আর সবশেষে ২০১৫ সালে "বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের

সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে" শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি (প্রকাশক: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা)। আজকের বঙ্গবন্ধু স্মারক বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত প্রবন্ধটির ভাবনা-ভিত্তি হিসেবে উল্লিখিত গ্রন্থসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার বক্তৃতা-লেখনিসমূহকে ধরে নিলে অত্যুক্তি হবে না।

২. "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—সারকথা ও বিনির্মাণপ্রক্রিয়া

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন" হলো জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি (world view), জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজ ভাবনা, রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রগতি ভাবনার যৌথরূপ। তবে 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'—এসবের সাধারণ পাটিগাণিতিক যোগফল নয়, নয় তা বিচ্ছিন্ন। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" হলো এসবের পরস্পরসম্পর্কিত এক সমগ্রক রূপ (holistic form)।

সবার ওপরে জনগণ (supremacy of people); জনগণের অন্তর্নিহিত অপার শক্তি ও অসীম ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস; জনগণ এবং কেবল জনগণই হতে পারে প্রজাতন্ত্রের মালিক, যা হবে মর্মগতভাবে শোষিতের গণতন্ত্রব্যবস্থা; জনগণ এবং কেবল জনগণই সার্বভৌম, অন্য কেউ নন; জনগণ এবং কেবল জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে– এসবই বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-দর্শনের মূলভিত্তি। জনগণের স্বার্থ বিশেষত দরিদ্র মেহনতি মানুষের স্বার্থ ছিল তাঁর কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

"জনগণ-বোধ"ই বঙ্গবন্ধু-দর্শনের ভিত্তিকথা। আর সে কারণেই দেশপ্রেমের যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি ভালোবাসার যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও সহমর্মিতার যত রূপ আছে; মানুষের প্রতি আস্থার যত ধরন আছে; মহানুভবতার যত রূপ আছে; ন্যায় প্রতিষ্ঠার যত সংগ্রামী রূপ আছে– এত বহুমুখী বিরল বৈশিষ্ট্য যে একক ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল–তিনিই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এসবই বঙ্গবন্ধুর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজ ভাবনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রগতি ভাবনা ও রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি। এসবই বঙ্গবন্ধুকে করেছে "দেশজ উন্নয়নদর্শনের" (home grown development philosophy) উদ্ভাবক, স্রষ্টা, বিনির্মাতা।

সামন্ত-সেনাশাসিত আধা ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান কাঠামোতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি এ দেশের মানুষের সুদীর্ঘ লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফল। তা এ দেশের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ-বয়স-পেশা-ধনী-নির্ধননির্বিশেষে সকলের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার ফসল। আর মুক্ত ও স্বাধীন হবার আমাদের এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি যে ব্যক্তি, যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব জনগণের অধিকার রক্ষার স্বার্থে তাঁর সারাজীবনে কখনও কোনো ধরনের আপোষ ব্যতীতই বাস্তবে রূপান্তরের নেতৃত্ব দিয়েছেন—তিনিই বঙ্গবন্ধু—জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই ১৯৭১-এ আমরা মুক্তিযুদ্ধ করলাম। যে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানিসহ (এ সংখ্যাটি আমার হিসেবে কমপক্ষে ১০ লক্ষ[১]) ব্যাপক মানবিক ও ভৌত অবকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে আমরা অর্জন করলাম স্বাধীনতা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধু শুধু একটি 'দর্শন'ই বিনির্মাণ করেননি তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐ দর্শনের রাজনৈতিক প্রয়োগও করেছেন। আবার একই সাথে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু তাঁরই বিনির্মিত দর্শনের রাজনৈতিক প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ দর্শনকে উত্তরোত্তর শাণিত করেছেন।

---

[১] আমার এ হিসেবের পদ্ধতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির জন্য দেখুন: বারকাত আবুল (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ: ৫৫-৫৭।।

একথা নির্দ্বিধায় সত্য যে, "হাজারো ষড়যন্ত্রের" মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতিকে উপহার দিলেন স্বাধীনতা। "হাজারো ষড়যন্ত্র" কথাটি বলার আমার সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক কারণ আছে, যা হয়তো বা তরুণ প্রজন্মসহ এদেশের অধিকাংশ মানুষের এখনও পর্যন্ত অজানা। ষড়যন্ত্রের বিষয়টি এ রকম: ২১ মার্চ ১৯৭১ সকাল—মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর প্রাক্তন কর্মকর্তা তৎকালীন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্টদূত জোসেফ ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রাক্-ধারণা ছিল এ রকম– *"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বুঝেছে যে বাঙালিরা পিছু হটবে না। ওরা বুঝেছে এ দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণকে কোনো পথেই কোনো পদ্ধতিতেই আর ঠেকানো সম্ভব নয়। তাই মার্কিন সরকারের রাষ্ট্রদূত মারফত প্রেরিত প্রস্তাব অনুরূপই হবে"*। তা-ই হলো। জোসেফ ফারল্যান্ড আসলেন এবং তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছে মার্কিন সরকারের প্রস্তাবটি পেশ করলেন। তিনি বললেন, *"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে সবধরনের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত, এমনকি তারা বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতার ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে এক শর্তে, শর্তটি হলো: চট্টগ্রাম থেকে ১৫০ মাইল দক্ষিণে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বুকে অবস্থিত সেন্টমার্টিন দ্বীপটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দীর্ঘ মেয়াদে ইজারা দিতে হবে"*। প্রস্তাবটি বঙ্গবন্ধু শোনামাত্র শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি, জোসেফ ফারল্যান্ডকে মুখের ওপর বলেছিলেন *"মিস্টার ফারল্যান্ড আমি আপনাকে চিনি। ইন্দোনেশিয়া ও আর্জেন্টিনায় আপনি সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে ছিলেন তাও আমি জানি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আমার দেশকে পাকিস্তানি শেয়ালদের হাত থেকে মুক্ত করে আমেরিকার বাঘদের হাতে তুলে দিতে পারি না। আপনাদের এ ধরনের শর্ত আমার কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। হতেও পারে না"*[২]।

মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা তো অর্জিত হলো। কিন্তু আসলে কী চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু? কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন? গড়তে চেয়েছিলেন কোন বাংলাদেশ? আমার মতে, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তাঁরই উদ্ভাবিত দেশের মাটি থেকে উত্থিত অথবা স্বদেশজাত উন্নয়নদর্শনের ভিত্তিতে এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে, যে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা; যে বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী; যে বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত; যে বাংলাদেশে মানবমুক্তি (liberty অর্থে) নিশ্চিত হবে; যে বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে মানুষের সুযোগের সমতা; যে বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-শোষণহীন-বৈষম্যহীন-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক দেশ; যে বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ; যে বাংলাদেশে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে; যে বাংলাদেশ হবে সুস্থ-সবল-জ্ঞান-চেতনাসমৃদ্ধ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আলোকিত মানুষের দেশ।

কেমন বাংলাদেশ চাই প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন *"আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোনো অগণতান্ত্রিক কথা মাত্র নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ব "*।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতিদর্শন গণমানুষের স্বার্থ-কল্যাণ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামেরই ফসল। বঙ্গবন্ধুর প্রগতি দর্শনের অন্যতম সুস্পষ্ট প্রতিফলন হয়েছে ১৯৭২-এর সংবিধানের

---

২ বিস্তারিত দেখুন, মোতাহার হোসেন সুফী, ২০০৯, ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ: ২৭৬-২৭৭।

প্রস্তাবনায়, যেখানে বলা হয়েছে *"আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা– যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"* এ কথা বলার পর বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতিদর্শনের স্পষ্টতা নিয়ে আর কোনো কথা না বললেও চলে।

নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটি করলেন তা হলো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন। এ ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধু তাঁর গভীর দেশপ্রেম, বিরল প্রতিভা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র গঠনে দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ; আর সংবিধান রচিত হয়ে গেল ৪ নভেম্বর ১৯৭২-এ—অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ১০ মাসের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেল। ইতিহাসে এও এক বিরল দৃষ্টান্ত যে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে এত কম সময়ের মধ্যেই সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেল; তাও আবার যেনতেন সংবিধান নয়—জনগণের শক্তির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপার আস্থা-বিশ্বাসনির্ভর দেশজ উন্নয়ন নিশ্চিত করার দর্শনগত ভিত্তির সংবিধান। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা নিরসনসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি ও বিকাশউদ্দিষ্ট চার স্তম্ভভিত্তিক (সংবিধানের মূলনীতি) বিরল এক সংবিধান। স্তম্ভ চারটি হলো: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা কেমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম, তা স্বল্প কথায় বোঝাবার জন্য সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং ১০নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। ১৯৭২-এর সংবিধানে প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ***"আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগে ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল–জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে"***। আর সংবিধানের ১০নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, ***"মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"***।[৩] বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এ সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলেই সহজেই বোঝা যাবে যে আসলে কেমন বাংলাদেশ তিনি গড়তে চেয়েছিলেন। সংবিধানে বিধৃত সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের কয়েকটি নিম্নরূপ, যা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মর্মবস্তুর সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ—যেখানে তিনি বলেছিলেন, আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই, মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই; শোষণহীন-বঞ্চনামুক্ত-বৈষম্যহীন সমাজ চাই, সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ চাই; উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন গরিব দুঃখী-আর্ত মানুষের 'ন্যায্য হিস্যার' কথা:

---

৩ অসাংবিধানিক পথে ক্ষমতাদখলকারী অবৈধ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে প্রথমবার এবং ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয়বার ঘোষণা দিয়ে এ অনুচ্ছেদটি সংবিধান থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯ প্রণয়ন করেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট ২৯ আগস্ট ২০০৫-এ পঞ্চম সংশোধনী নিয়ে স্পষ্ট রায় দিলো যে "পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯ সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক, বে-আইনি, অবৈধ, বাতিল এবং ঐতিহাসিক অপরিণামদর্শী"। রায় দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক [বিস্তারিত দেখুন, সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী সম্পাদিত The Bangladesh Law Times, The Constitution (Fifth Amendment) Act's Case Citation: 14 BLT (Special Issues), 2006, পৃ: ২৪০-২৪২]।

১. প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে (*সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১*)

২. অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (*অনুচ্ছেদ ১৫.ক*)

৩. কর্মের অধিকার; যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কাজের নিশ্চয়তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)

৪. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (*অনুচ্ছেদ ১৫.খ*)

৫. সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা;... মানুষে-মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (*অনুচ্ছেদ ১৯/১, ২*)

৬. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; ...আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর (*অনুচ্ছেদ ১৭ ক, খ*)

৭. মেহনতি মানুষকে– কৃষক ও শ্রমিককে– এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান (*অনুচ্ছেদ ১৪*)

৮. জীবনযাত্রার বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লবসহ গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধন (*অনুচ্ছেদ ১৬*)

৯. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ (*অনুচ্ছেদ ১০*)

১০. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (*অনুচ্ছেদ ১১*)

১১. ...জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না (*অনুচ্ছেদ ৩২*)

১২. ... কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না (*অনুচ্ছেদ ২৮.১*)

১৩. আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান (*অনুচ্ছেদ ২৭*)

১৪. আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। ...স্থানীয় সরকার (সংসদে আইন পাশ সাপেক্ষে) যে সকল দায়িত্ব পালন করিবেন তার অন্তর্ভুক্ত হইবে: প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য; জন শৃংখলা রক্ষা; জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (অনুচ্ছেদ ৫৯)

১৫. (সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য (অনুচ্ছেদ ২১.২)।

মোদ্দাকথা হলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ, যেখানে জনগণ এবং একমাত্র জনগণই সার্বভৌম। মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত এই দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু কমপক্ষে দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে ৫১ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জনগণের মৌল আকাঙ্ক্ষা ছিল: প্রথমত, বৈষম্যহীন এক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র গঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক (secular) মানসকাঠামো বিনির্মাণ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐ আকাঙ্ক্ষার কাজটি ঠিকঠাকই শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী তিন-চার বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত-লণ্ডভণ্ড বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষামুখী ছিল।

এতক্ষণ যা বললাম তার সারবস্তু এ রকম: সুদীর্ঘ ৩৮ বছরে (১৯৩৭-১৯৭৫) লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন-বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, যারই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এবং এবং এ ধারাবাহিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর স্বকীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি-উন্নয়ন দর্শন (বঙ্গবন্ধুর দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ছক ১-এ দেখানো হয়েছে)। বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন (বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি), রাজনৈতিক দর্শন এবং উন্নয়ন (প্রগতি) দর্শনে নিঃসন্দেহে ভূমিকা রেখেছিল সমসাময়িক বিশ্বের রাজনৈতিক ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহের মিথষ্ক্রিয়া। এসব পরিবর্তনের অন্যতম হলো ১৯১৭ সালে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব–রুশ বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লবপরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুতলয়ে আর্থ-সামাজিক মৌলিক পরিবর্তন (যে সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১৫-২০-এর কোঠায়); সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভাব এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা; ১৯২৯-৩৩ সালে মহামন্দায় (great depression) আর্থসামাজিক সিস্টেম হিসেবে পুঁজিবাদের প্রথম বৈশ্বিক পতন-লক্ষণসমূহ যা শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গিয়ে ঠেকলো (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ১০ বছর থেকে ২৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার আবির্ভাব এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার সাথে সমাজতন্ত্রের স্নায়ুযুদ্ধ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ বছর থেকে ৩৫ বছর); দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে উপনিবেশসমূহে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয় এবং এ আন্দোলনে ভারতবর্ষে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৮ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে); ১৯৪০-৫০ এর দশকে সমাজতান্ত্রিক চীনা বিপ্লব, চীনের অগ্রযাত্রা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৫ থেকে ৪০ বছর); ১৯৬০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন যেমন ল্যাতিন আমেরিকায় বিশেষত পানামা, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়ায় মার্কিন আগ্রাসন, কিউবার বিপ্লব ও বিপ্লবী চেগুয়েভারা হত্যা (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪০ থেকে ৫০ বছর); ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলন (যখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ৪৪ থেকে ৫০ বছর); দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অসারতা এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈর-সেনা-সামন্ত শাসনের আওতায় শোষণ-নির্যাতনসহ বৈষম্যপূর্ণ দুই অর্থনীতি সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি (এ সময়কালে বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৭ বছর থেকে ৫০ বছর)।

ছক ১: বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, আর্থসামাজিক উন্নয়নদর্শন– যোগসূত্র এবং মূলনীতি-ভিত্তিসমূহ

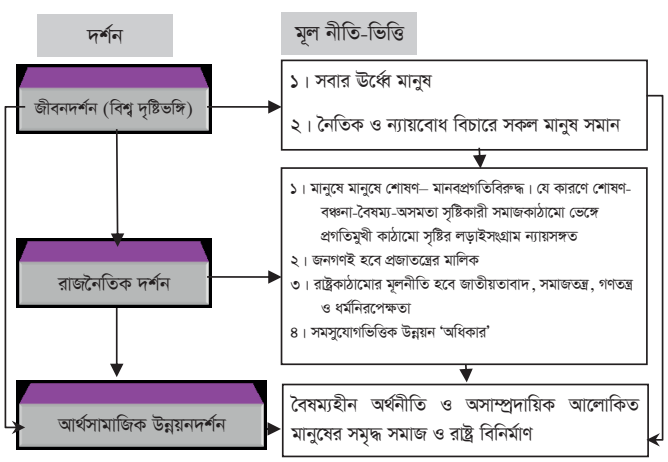

বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত দর্শনের মূর্ত রূপই হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের গণ-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কী এমন হলো যে ওই জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হলো না। এর মূল কারণ কী? আমার মতে, কারণটি এ রকম: বঙ্গবন্ধু যেদিন থেকে (১৯৭২ সালের ২৬ মার্চে প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে) সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক-জাতীয়তাবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কথা বলছেন, বলছেন নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে, ঠিক তখন থেকেই ইতোপূর্বে সংগঠিত-সংঘবদ্ধ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী প্রতিবিপ্লবীরা আরও দ্রুতলয়ে আরও বেশি শক্তি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর দর্শনবিরোধী তাদের ষড়যন্ত্র-কর্মকাণ্ড জোরদার করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের দালাল মোশতাক-তাহের উদ্দিন ঠাকুর-মাহবুবুল আলম চাষী চক্রের ষড়যন্ত্র;[৪] জিয়াউর রহমানসহ কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল সেনাসদস্যের সরকার পতনের ষড়যন্ত্র; ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতন্ত্র[৫]; দুর্নীতি[৬], সুযোগের অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকা রাজাকার-আলবদর-আলশামসসহ জামায়াতে ইসলাম ষড়যন্ত্র; মূল্যস্ফীতি ডবল ডিজিটে পৌঁছে দেয়ার সফল ষড়যন্ত্র; খাদ্যগুদাম লুট, মজুতদারিসহ[৭] খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অকেজো করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পিএল ৪৮০-এর আওতায় সবচে মারাত্মক মারণাস্ত্র "খাদ্যের রাজনীতি" প্রয়োগ[৮] (উপলক্ষ হিসেবে শর্ত দিয়েছিল আমরা সমাজতান্ত্রিক কিউবায় পাট বেচতে

---

৪ মোশতাক-ঠাকুর-চাষীসহ সমজাতীয় ষড়যন্ত্রকারীরা হয় ইতিহাসজ্ঞানে কাঁচা ছিলেন অথবা জ্ঞানপাপী ছিলেন অথবা জাস্ট বেঈমান চরিত্রের অমানুষ ছিলেন অথবা একই সাথে সবগুলো। এখানে বাংলার ইতিহাসের কিয়দংশ স্মরণ করা সমীচীন হবে। ১৭৫৭ সাল– ভারতবর্ষের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে উপনিবেশবাদী ইংরেজরা (১৭৫৭ সালের ২৯ জুন) মীর জাফরকে বাংলার নবাব পদে বসালেন। প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু ইংরেজদের হাতেই রয়ে গেল। মীর জাফরের অযোগ্যতা-অদক্ষতার কারণে তারই জামাতা মীর কাসিম হলেন বাংলার নবাব। তবে মীর কাসিম ছিলেন স্বাধীনচেতা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মচারীরা যখন ব্যক্তিগতভাবে বিনা শুল্কে ব্যবসার অধিকার দাবি করে বসল, তখন মীর কাসিম আপত্তি জানালেন। এ নিয়ে নবাবের সাথে বিরোধ শেষপর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হলো। মীর কাসিমের দুই ঘনিষ্ঠ–নবাব সুজাউদ্দৌলাহ ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজদের সাথে হাত মিলালো। আর মীর কাসিম পলাতক হয়ে ১৭৭৭ সালে অজ্ঞাত অবস্থায় মারা গেলেন।

৫ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে ঔপনিবেশিক মানসিকতার আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন নিয়ে বঙ্গবন্ধু বললেন "উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীন জাতির জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী একটি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামো। এর কিছু আমলা ঔপনিবেশিক মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তারা এখনও বনেদি আমলাতান্ত্রিক মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। আমরা তাদেরকে স্বাধীন জাতীয় সরকারের অর্থ অনুধাবনের উপদেশ দিচ্ছি। এবং আশা করছি, তাদের পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। আমার সরকার নব-রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে প্রশাসনযন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামোতে জনগণ ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টির পূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।" বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে দেশ উল্টোপথে পরিচালিত হয়েছে। ফলে আমার মতে, অবস্থাটা এখন এরকম– দেশ চালায় rent-seeker-রা আর শাসন-প্রশাসনযন্ত্রের আমলারা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ rent-seeker-দেরই অধীনস্থ সত্তা; রাষ্ট্রযন্ত্রের সবকিছুই এখন rent-seeker-দের কথায় ওঠাবসা করে। আর এসবের ফলে জনগণের সাথে সরকারের নৈকট্য নয় দূরত্ব বেড়েছে এবং তা ক্রমবর্ধমান।

৬ পাকিস্তান কারাগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন "...বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ"।

৭ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষে বেতার-টেলিভিশন ভাষণে মজুতদারদের হুঁশিয়ার করে বঙ্গবন্ধু বললেন "বিপুল খাদ্য ঘাটতি আমাদের জন্য এক দুঃসহ অভিশাপ।... সামনের কয়েক সপ্তাহ আমাদের জন্য ঘোর দুর্দিন। ... এ প্রসঙ্গে আমি মজুতদার, চোরাকারবারী ও গুজববিলাসীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি , তারা যেন নিরন্ন মানুষের মুখের রুটি নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে– তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।" অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খাদ্য মজুত ও চোরাকারবার নিয়ে ষড়যন্ত্রটা হয় শুরু থেকেই। এ ষড়যন্ত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃহৎ ষড়যন্ত্রের অংশমাত্র।

৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তাতে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আমি সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত। সাম্রাজ্যবাদের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পৃথিবীর সকল দেশেই রাজনৈতিক

পারব না)–এসবই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করল। প্রকৃত সত্য হলো—বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন করা নিশ্চিত করা হলো। সৃষ্টি করা হলো এমনই অস্থিতিশীল ও জটিল পরিস্থিতি, যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করলেও কেউ সংগঠিতভাবে রুখে দাঁড়াবে না। প্রতিবিপ্লবী এ শক্তি তাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কাজটি দক্ষতার সাথেই সম্পন্ন করে ফেলল– ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে[৯]। এই একই খুনিচক্র ১৯৭৫-এর ৩

পরিবেশসহ রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে রীতিমতো নির্মোহ গবেষণা করে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শ-নীতি-দর্শন তারা দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা-পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হয়েছিল। যার অন্যতম (১) বঙ্গবন্ধু শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার কথা বলেন, (২) বঙ্গবন্ধু জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (National Liberation Movement)-এর সমর্থক, যেখানে সমাজতন্ত্রের তত্ত্বানুযায়ী উন্নয়নশীল দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমাজতন্ত্রের পক্ষের প্রাথমিক ধাপ, (৩) বঙ্গবন্ধু ১৯৭১-এর ২১ মার্চ পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাব "বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সেন্টমার্টিন দ্বীপ যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘ মেয়াদে ইজারা দিলে মার্কিন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দেবে"টি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, (৪) বঙ্গবন্ধু কঠিন শর্তের বৈদেশিক ঋণ-অনুদান নেবার বিপক্ষে ছিলেন; তিনি পরনির্ভরশীলতা পছন্দ করতেন না; স্বনির্ভর-স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী, (৫) বাংলাদেশে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হলে দুই মেরুর বিশ্বে সমাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পাবে, (৬) বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এর সংবিধানে 'সমাজতন্ত্রকে' সংবিধানের চার মূল স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, (৭) ভূ-রাজনৈতিকভাবে এবং অস্ত্র ব্যবসায় পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র ছিল পরস্পরের বন্ধু, (৮) বৈশ্বিক রাজনৈতিক সমীকরণে ছিল একদিকে যুক্তরাষ্ট্র-চীন আর অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন-ভারত, যেখানে সোভিয়েত-ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু শক্তি। এসব কারণে আমি সন্দেহাতীতভাবে মনে করি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার শুধু ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাই করেনি, তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাথে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত। আর এসব কারণে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়িসহ (bottomless basket) আরো অনেক ধরনের অন্যায় উক্তি, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও ব্যঙ্গ-কটূক্তি করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ যে বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ মোশতাক-ফারুক-রশিদ-জিয়াউর রহমানের পুনর্বাসন করেছিল, তা এখন দালিলিকভাবেই প্রমাণিত। সিআইএসহ মার্কিন সরকারের দলিলপত্রেই উল্লেখ আছে: (জাতির জনক বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের প্রতি হেনরি কিসিঞ্জারের ব্যক্তিগত বিরাগ ছিল; কিসিঞ্জার বলেছেন 'মুজিব ছিলেন বিশ্বসেরা বোকাদের একজন'; সিআইএর ১৯৭২ সালের ২১ ডিসেম্বর নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে 'সরকার পরিবর্তন হবে এক আকস্মিক আঘাতে'; 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিক্সন-কিসিঞ্জার ঐতিহাসিক পক্ষপাতদুষ্ট'; ফারুক-রশিদ তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটির পক্ষে ১৯৭২ সালে ঢাকায় মার্কিন দুতাবাসে গিয়েছিল'; 'জিয়া পঁচাত্তরের অক্টোবরের আগে বঙ্গবন্ধুহত্যাপরবর্তী সম্ভাব্য ভারতীয় হস্তক্ষেপ ঠেকাতে মার্কিন সাহায্য চান–তখন তিনি নেপথ্যের নায়ক'; ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার– খন্দকার মোশতাক ও জিয়া সরকার যেন টিকে থাকে, সে জন্য তৎপর ছিল; বোস্টার সাহেব বলেছিলেন '১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট-এর ঘটনা যারা ঘটিয়েছেন, তারা দায়িত্বহীন নন'; ১৯৭৫-এর ২০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর সাথে প্রথম বৈঠকেই মোশতাক বোস্টারের হাত চেপে ধরে বলেছিলেন 'যে সুযোগ একাত্তরেই হারিয়েছি, তা এবার আর হাতছাড়া করা যাবে না'; বঙ্গবন্ধুর খুনিদের প্রতি কিসিঞ্জার যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান যে কারণে 'ফারুক রহমানরা ব্যাংককে গিয়েও মার্কিন কূটনীতিকদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বৈঠক করেন'; কিসিঞ্জার বলেছিলেন 'মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পেরে ধন্য মনে করছি' (বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান খান, ২০১৪, মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড, প্রথমা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ: ১০, ৫২, ৬১-৬৬, ৭৩, ১০৮, ১৯০)।

৯ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা লিখেছেন "সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে কিছু বিপথগামী উচ্চাভিলাষী অফিসারের হাতে প্রাণ দিয়েছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং এই কুচক্রীরা জাতির জনককে হত্যার মাধ্যমে তাঁর অনুসৃত কর্মসূচিকে বানচাল করে বাংলাদেশে প্রগতির ধারা পাল্টে দেয়ার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে" (শেখ হাসিনা, ২০১৫, শেখ মুজিব আমার পিতা, পৃ: ৩৭, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী")। এখানে আরও উল্লেখ জরুরি যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ভারতীয় মেজর জেনারেল (অব.) এস এস উবান তার "Phantoms of Chittagong:. The "Fifth Army" in Bangladesh" গ্রন্থে লিখেছেন: "লক্ষ করলাম তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) বাসার কোথাও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। ...তাঁর সাথে দেখা করতে আসা

নভেম্বর কারাগারে আটক চার জাতীয় নেতাকেও (সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও এ এইচ এস কামারুজ্জামান) হত্যা করল।

১৯৭৫ সালে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঐ দুই মৌল-আকাঙ্ক্ষার **সোনার বাংলাদেশ** গঠনের স্বপ্নকেই হত্যা করল। বঙ্গবন্ধু হত্যার মাধ্যমে শুধু যে আমাদের সোনার বাংলা গড়তে দেয়া হয়নি তা-ই নয়, সেই সাথে সবধরনের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র হয়েছে যে কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশকে পশ্চাৎমুখী করে একটি প্রগতিবিরুদ্ধ অকার্যকর রাষ্ট্রে (failed state) এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়। আর সে কারণেই পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘসময় লাগাতার সেনাশাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনাশাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি তোষণ ও পোষণ, মৌলবাদের অর্থনীতি ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত– এসবের ফলে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারা; দেশি-বিদেশি দুর্বৃত্তদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সামরিক ছাউনিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; সামরিক ফরমানের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থবিরুদ্ধ বিষয়াদি বিশেষত "ধর্মনিরপেক্ষতা"সংশ্লিষ্ট ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি কর্তন-পরিবর্তন করে বিলুপ্ত করা হয়েছে[১০]; স্বাধীনতাবিরোধী নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করা হয়েছে; যুদ্ধাপরাধীসহ সকল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হয়েছে; শুধু পুনর্বাসনই নয়, স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের রাষ্ট্রক্ষমতার-সরকারের অংশীদার করা হয়েছে; সন্ত্রাস, কালোটাকা ও পেশিশক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে "নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলার" যে কথাটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন—সেটাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়েছে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যে বা যারাই থাকেন না কেন চালকের আসনে কোনো না কোনোভাবে শক্তভাবে বসে পড়েন তারা, যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করেন

মানুষজনের কোনো বাছ-বিচার নেই– একথা তুলতেই তিনি বললেন– 'আমি জাতির জনক। দিন-রাতের যেকোনো সময়ে আমার কাছে প্রত্যেকের আসার অধিকার আছে। কেউ যদি কষ্ট-বেদনায় থাকে, তার সামনে তো আমি আমার দরজা বন্ধ করে দিতে পারি না"। এরপর জেনারেল (অব.) উবান লিখছেন "আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার এ অনুভূতিতে মুগ্ধ, তবে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি জাতির প্রতি দায়বদ্ধ। ...আমার মনে হয়, জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতারা ঝুঁকি নিয়ে থাকেন, কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে মুজিব যতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ততদূর খুব কমসংখ্যকই গিয়েছেন" (মূল গ্রন্থের অনুবাদক হোসাইন রিদওয়ান আলী খান, ঘাস-ফুল-নদী প্রকাশনা, ২০১৪, ঢাকা: পৃ: ১৪২)।

[১০] ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের "প্রস্তাবনার" উপরে (অথবা অন্য কোথাও) "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম" লেখা ছিল না, যা বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে তেমন সময়ক্ষেপণ না করেই সংযোজন করা হয়েছে। কাজটি করলেন সেনাশাসক রাজাকার পুনর্বাসনকারী "মুক্তিযোদ্ধা" জিয়াউর রহমান। ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে 'ধর্ম' বিষয়ক চেতনা ছিল "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার" (যেটাই ধর্মনিরপেক্ষতার মর্মবস্তু)। ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে ছিল না "রাষ্ট্রধর্ম" বলে কোনো কিছু। কিন্তু বঙ্গবন্ধুপরবর্তীকালে এখন সংবিধানে স্পষ্ট লেখা "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন" (সংবিধান, পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১, ২০১১ সালের ১৪ নং আইন-এর ৪ ধারাবলে ২ক অনুচ্ছেদে প্রতিস্থাপিত)। "রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম" করে ছাড়লেন স্বৈরশাসক-সেনাশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ। উল্লেখ্য, ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার" নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল; সংবিধানের "ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা" শীর্ষক অনুচ্ছেদে (১২নং অনুচ্ছেদ) রাষ্ট্র পরিচালনায় অন্যতম মূলনীতি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, কোনো বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে। (১৯৭২-এর সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১২)।

না–যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয়কারী লুটেরা শ্রেণি (যাদের বলা হয় Rent-Seeker)[১১] হিসেবে সরকার ও রাজনীতিব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ-কব্জাগত করে ফেলেন। এটাই ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী আমাদের ইতিহাসের মূল কথা। এ মূল কথা ভুলে গেলে ইতিহাস বিকৃতি হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সামনে এগুনো অসম্ভব হবে।

বঙ্গবন্ধু-দর্শন-এর শ্রেষ্ঠ প্রতিচ্ছবি আমাদের সংবিধান বলছে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। সংবিধানে মানুষে-মানুষে বৈষম্যের বিপরীতে সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি–বাতিল ঘোষিত হয়েছে, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালে দেশ পরিচালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিক উল্টোপথে। স্বপ্ন ছিল সমতাভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা গঠনের; কিন্তু তার জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে নয়া-উদারবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতি (যা মুক্তও নয়, দরিদ্রবান্ধব তো নয়ই), যা কোনো অর্থেই বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; বরং সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর জনকল্যাণবিরোধী ব্যবস্থা। নয়া-উদারবাদী মুক্তবাজারব্যবস্থাভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করেছে: বেড়েছে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য। পাশাপাশি বেড়েছে গুটিকয়েক সুপার-ডুপার ধনী, জনগণের জীবন পরিচালনে প্রয়োজনীয় পণ্যের (ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) মূল্যবৃদ্ধি, দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত শ্রমশক্তির অভাব, মনুষ্যশ্রমের স্বল্পমূল্য (মজুরি), কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, বিচারিক অন্যায্যতা, দুর্নীতি, দুঃশাসন, উগ্র সাম্প্রদায়িকতা–পরস্পরসম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনকে দুর্বিষহ করেছে। এসব থেকে মুক্তির পথ একটাই। আর তা হলো বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশজাত-বৈষম্যহীন-শোষণমুক্ত-অসাম্প্রদায়িক" উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়ন।

---

[১১] সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় Rent-seeker ও Rent-seeking বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বিষয়টি এ রকম– বিত্তবান বা সম্পদশালী হওয়া যায় দু'ভাবে বা দু'পদ্ধতিতে। প্রথম পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে (by creating wealth)– এটা rent seeking নয়; এ পদ্ধতিতে সমাজের মোট বিত্ত-সম্পদ বাড়ে (total wealth increases)। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিত্তবান-সম্পদশালী হওয়া যায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ, অধিগ্রহণ, হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, লুটতরাজ, আত্মসাৎসহ সমরূপী বিভিন্ন অনৈতিক ও অসভ্য পদ্ধতিতে। দ্বিতীয় পদ্ধতির এসবই rent seeking; আর এসবের সাথে যুক্ত যারা, তারাই rent-seeker। প্রথম পদ্ধতি যেখানে সমাজের মোট বিত্ত (wealth) বাড়ায় সেখানে rent seeking এর পরিণাম হয় ঠিক উল্টো। Rent seeking সমাজের মোট বিত্ত কমায় এমনকি ধ্বংস করে (total wealth decreases or destroys total wealth)। Rent seeking পদ্ধতির সরব উপস্থিতির অর্থ হলো সমাজের উঁচুতলার বিত্তবানদের বিত্তের বড় অংশ আর নিচুতলার মানুষের দুর্দশার উৎস– বিত্তের সৃষ্টি নয় (not creation of wealth) বিত্তের হস্তান্তর (wealth transfer অর্থে)। এ পদ্ধতিতে আবিষ্কারটা হলো এ রকম: উপর তলার ধনীরা জনগণের সম্পদসহ নিচতলার মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ হাতড়ে নেবে, কিন্তু নিচতলার মানুষ বুঝতেই পারবে না–কীভাবে কী হয়ে গেল! আর rent seeking-এর এই প্রক্রিয়ায় rent-seeker-দের সাথে রাজনীতি ও সরকারের এক অশুভ সমস্বার্থের সম্মিলন ঘটে যা দুর্ভেদ্য– যে ত্রিভুজটি দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। এ ত্রিভুজ যতদিন বহাল থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে (Rent-seeker ও Rent seeking বিষয়ের মর্মকথা বিস্তারিত জানতে দেখুন: আবুল বারকাত, ২০১৭, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ: ২৩-৩৪)।

৩. "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—প্রারম্ভিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ফল

মহান মুক্তিযুদ্ধে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালাল-দোসররা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের যে ক্ষয়-ক্ষতি করেছিল—তা যেকোনো মাপকাঠিতেই ছিল অপূরণীয় ও অপরিমেয়। এ অবস্থায় "বঙ্গবন্ধুর-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৭২ সালে দু'ধরনের বৃহৎ বর্গের কর্মকাণ্ডে। প্রথমটি, আশু-তাৎক্ষণিক-জরুরি প্রকৃতির এবং কিছুটা বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন বিষয়ক; আর দ্বিতীয়টি, দেশের ভিতরে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি ও সমাজ পুনঃগঠন-পুনঃনির্মাণ-এর মাধ্যমে বলা যায়, জিরো অবস্থা থেকে শুরু করে মুক্ত-স্বাধীন দেশের অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তোলা, যা কোনো অর্থেই সহজ কাজ ছিল না, কারও কারও মতে কাজটি ছিল অসম্ভব।

তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তো মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' ('Bangladesh is a bottomless basket') আখ্যায়িত করে বলতে চেয়েছিলেন *'কথা তো শুনলে না, দেখি মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্রের নামে তোমাদের কোথায় নেয়'*। এ দলে কিসিঞ্জার একা ছিলেন না। অর্থনীতিবিদদের নমস্য তত্ত্বগুরু জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের উন্নয়নসম্ভাবনা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে রীতিমতো গুরুগম্ভীর এক পুস্তকই লিখে ফেললেন, যার শিরোনাম "Bangladesh: The Test Case of Development" অর্থাৎ "বাংলাদেশ–উন্নয়নের এক টেস্ট কেইস"। যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় নিয়ে তারা এ উপসংহারে উপনীত হলেন যে উন্নয়নের তেমন কোনো সম্ভাবনা বাংলাদেশের নেই। ফাল্যান্ড ও পারকিনসন সাহেব ঐ গবেষণা (!) গ্রন্থে যা বললেন, তার সারকথা এ রকম: *"বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১ কোটি হলে ভালো হতো। কিন্তু জনসংখ্যা ৮ কোটি, তাও আবার ক্রমবর্ধমান। সে কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অবস্থা আরও খারাপ-ভয়ঙ্কর রকমের খারাপ হতে বাধ্য (তাদের ভাষায় "certainly get worse, terribly worse")।* তাদের বিশ্লেষণের শেষ কথাটি এ রকম: *"বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সফল হতে পারে, তাহলে পৃথিবীর যেকোনো দেশই তা পারবে"*[১২]।

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক প্রয়োগ যে ফলপ্রদ হলো, তা তিনি ১৯৭২ সালে যা যা করলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতাটিতে একবার চোখ বুলালেই সহজে বুঝা যায় (ছক ২ দেখুন)। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু উল্লেখিত বৃহৎ বর্গের অন্তর্গত প্রথম যে ধরনের কাজগুলি করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যেসব অস্ত্র ছিল তা সমর্পণ করানো; ভারতফেরত ১ কোটি শরণার্থীসহ মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন; শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গকে সহযোগিতা প্রদান; স্বল্প সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন; সরকার পরিচালনে ঔপনিবেশিক আইনব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিপর্যস্ত প্রশাসনিক কাঠামোর গণমুখী পরিবর্তনসহ দক্ষ প্রশাসক সৃষ্টি; মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের আটক করে বিচারের আওতায় আনা; বাংলাদেশে অবস্থানকৃত প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে ভারতে ফেরত পাঠানো; পাকিস্তানে আটকেপড়া প্রায় ৪ লাখ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে আনা; প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন; স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট প্রণয়ন; স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের যত দেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন; জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন; যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক অনুদান-সহযোগিতা প্রাপ্তির সর্বাত্মক সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা; আন্তর্জাতিক

---

[১২] দেখুন, জাস্ট ফাল্যান্ড ও জে আর পারকিনসন, ১৯৭৭, Bangladesh: The Test Case of Development, New Delhi: S. Chand & Company Ltd, পৃ: ১৯৭।

জ্বালানি তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব মোকাবেলা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র নস্যাতের প্রচেষ্টা; মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির দেশবিরোধী সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড মোকাবেলা; সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা; ব্যাংক-বীমা, পাট শিল্পসহ বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ; কৃষকদের খাজনা হ্রাস ও বকেয়া খাজনা মওকুফ ইত্যাদি। ছক ২-এ প্রদর্শিত স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পিত প্রথম বছরের (১৯৭২ সালের) কর্মকাণ্ডের মাসওয়ারি খেরোখাতা শুধু একটি তালিকামাত্র নয়–তালিকায় কর্মকাণ্ডের যুক্তিপরম্পরা অনুধাবন না করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিচার অসম্পূর্ণ হবে। এ তালিকাটি বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টিসহ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পরিচালনে অগ্রাধিকারক্রম বিবেচনায় তাঁর মেধা-মনন, প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের সুস্পষ্ট পরিচায়ক। এককথায় কর্মযজ্ঞের অগ্রাধিকারক্রম (priority) এবং কালানুক্রম (sequence) স্পষ্ট নির্দেশ করে যে ১৯৭২ সাল থেকেই "বঙ্গবন্ধু-দর্শনের" বাস্তব প্রয়োগ শুধু শুরুই হয়নি, তা স্বল্প সময়ে যথেষ্ট ফলপ্রদ হয়েছিল।

ছক ২: যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রথম বছরেই (১৯৭২ সালে) বঙ্গবন্ধু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেসব পদক্ষেপ নিলেন তার মাসওয়ারি খেরোখাতা

গৃহীত মূল পদক্ষেপসমূহ		মাস (১৯৭২ সালে)											
		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১.	মন্ত্রিসভা গঠন (১২ সদস্যবিশিষ্ট)												
২.	মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে নির্ধারিত হয়: জাতীয় পতাকা; জাতীয় সঙ্গীত; রণসঙ্গীত												
৩.	শরণার্থী পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বাসগৃহ পুনর্নির্মাণে ত্রাণ কমিটির রূপরেখা প্রণয়ন												
৪.	ভারতীয় সৈন্যদের দেশে ফেরত												
৫.	মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন												
৬.	শহিদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন												
৭.	মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের বিচারের জন্য "বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ" প্রণয়ন												
৮.	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কমিশন গঠন												

ছক ২ চলমান...

গৃহীত মূল পদক্ষেপসমূহ		মাস (১৯৭২ সালে)											
		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
৯.	ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগব্যবস্থা পুনর্গঠন/পুনর্নির্মাণ												
১০.	টেলিযোগাযোগব্যবস্থা চালু করা												
১১.	কৃষি পুনর্বাসন												
১২.	১৩৯টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন												
১৩.	সংবিধান প্রণয়ন												
১৪.	প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ												
১৫.	আন্তর্জাতিক অনুদান প্রাপ্তির কূটনীতি												
১৬.	মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ												
১৭.	ব্যাংক, বীমা, পাট, বস্ত্রকল জাতীয়করণ												
১৮.	বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা												
১৯.	১৯৭১ এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ												
২০.	প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ												
২১.	ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন												
২২.	পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ঘোষণা												
২৩.	বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ												
২৪.	ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজে নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ												
২৫.	শিক্ষকদের ৯ মাসের বন্ধ বেতন দেয়া												
২৬.	জরুরিভাবে ১৫০টি আইন প্রণয়ন												
২৭.	কৃষকদের (২৫ বিঘা পর্যন্ত) খাজনা মওকুফ												
২৮.	পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন												

ছক ২ চলমান...

গৃহীত মূল পদক্ষেপসমূহ		মাস (১৯৭২ সালে)											
		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
২৯.	রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ঘোষণা												

উৎস : বারকাত আবুল (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ: ৭৫-৭৭।
কালো রং-এর বক্সসংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের মাস নির্দেশ করছে।

স্বাধীনতার পরপরই 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর বাস্তব প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিদর্শন নিম্নরূপ:

১। মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবার-পরিজনসহ জীবন বাঁচাতে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী ১ কোটি শরণার্থীসহ দেশের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তু লক্ষ-লক্ষ বাস্তুচ্যুত-গ্রামচ্যুত-শহরচ্যুত পরিবারের পুনর্বাসন, দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বিধ্বস্ত বাসগৃহ পুনর্বাসনসহ এসব পরিবারে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের কাজটি ছিল বড় মাপের চ্যালেঞ্জ। এ সমস্যা সমাধানে অন্যতম প্রধান বাধা ছিল পাকিস্তানপন্থি স্থানীয় শাসন পরিষদ ও প্রশাসন। এসব বাধা অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ এর ৪ মার্চ নাগাদ মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে সামগ্রিক পুনর্বাসনসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত ৯ লক্ষ ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণ করে। এর অর্থ জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতিভূ মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মী একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটিতে হাত দিলেন তা হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের পুনর্বাসন।

২। ১৯৭১-৭২ সময়কালে কৃষিই ছিল এ দেশের অর্থনীতির প্রাণ। কৃষিকে পাকবাহিনী ও তাদের দালাল-দোসররা সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিয়েছিল। কৃষির চিরাচরিত কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের কথা বঙ্গবন্ধু যথামাত্রা গুরুত্ব দিয়েই ভেবেছিলেন; কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষিতে বিদ্যমান শ্রেণিকাঠামো জিইয়ে রেখে মুক্তিও আসবে না জনকল্যাণকামী উন্নয়নও হবে না। যুদ্ধবিধ্বস্ত কৃষি-খাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে বঙ্গবন্ধু যেসব বাস্তবভিত্তিক সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো: কৃষকদের জরুরি ভিত্তিতে কৃষিঋণ প্রদান ও বীজ সরবরাহ করা; গভীর ও অগভীর নলকূপ মেরামত ও পুনঃখনন করা; হালচাষের জন্য কয়েক লাখ গরু আমদানি করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা; ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা; একফসলি জমিকে দুই ফসলি জমিতে রূপান্তরের সবার্ত্মক প্রয়াস; খাসজমি ভূমিহীন-প্রান্তিক কৃষকসহ বাস্তুহারাদের মধ্যে বণ্টন; চর এলাকায় বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ; উপকূল অঞ্চলের মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক বান থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এসব ছাড়াও কৃষিতে শ্রেণিবৈষম্য হ্রাসে কৃষকদের মুক্তিসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু যেসব পদক্ষেপ নেন এবং ঘোষণা করেন, তার মধ্যে ছিল ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি খাস হিসেবে ঘোষণা; খাসজমি ও নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন; ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য খায়-খালাসী আইন পাস; বন্ধকী ও চুক্তি কবলা জমি ৭ বছর ভোগ করা হলে তা মালিককে ফেরত প্রদান, যাতে জোতদারদের কাছ থেকে কৃষক জমি ফেরত পান। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-অর্থনীতি বিনির্মাণে গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার

প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে যেখানে বলা হয়েছে, *"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা ও জনগণের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"*। এসবই স্পষ্ট প্রমাণ করে সরকারপ্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা, যার ভিত্তি-দর্শন ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ-অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় তার দৃঢ়মূল বিশ্বাস।

৩। ১৯৭২ সালে দেশে মোট খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ টন। সরকারের হাতে খাদ্যশস্যের মজুদ ছিল মাত্র ৪ লক্ষ টন। খাদ্য পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল সংকটময়; আর সংকট গুণিতক হারে বাড়লো কারণ একদিকে আমাদেরই আধাভুক্ত-অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানোর পাশাপাশি খাদ্য সরবরাহ করতে হবে ৯০ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দী ও আটককৃত ৫০-৬০ হাজার দালাল-রাজাকারদের (যারা খাদ্য ঘাটতি পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য মূল দায়ী) এবং সেইসাথে প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় মিত্র সেনাবাহিনীকে। খাদ্য ঘাটতি আর অতিনগণ্য মজুত নিয়ে এ সমস্যারও সমাধান করলেন বঙ্গবন্ধু সরকার। এ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার এক বিরল যোগ্যতার প্রমাণ।

৪। অপূরণীয়-অপরিমেয় মানবসম্পদ ক্ষতির পাশাপাশি পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দালালরা সবচে' বেশি ক্ষতি সাধন করেছে অবকাঠামোগত-ভৌত সম্পদের যার মধ্যে অন্যতম রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ (উৎপাদন-সঞ্চালন-বিতরণ), টেলিযোগাযোগ। অবকাঠামো ধ্বংস বিষয়টি যে শুধু পরিমাণের নিরিখে বিশাল ক্ষতি ছিল তাইই নয়, তা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে কৌশলগত দিক থেকেও ছিল অপূরণীয়। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বদেশে ফিরে ১২ জানুয়ারি ১২ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রী সভা গঠনের পরেই কোনো বিলম্ব না করে ১৯৭২-এর জানুয়ারি মাসেই ধ্বংসপ্রাপ্ত যোগাযোগব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগব্যবস্থা সংস্কার-নির্মাণ-পুনঃনির্মাণ-পুনঃগঠনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হাত দেন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্কারকাজে হাত দেন মার্চ মাসে (দেখুন খেরোখাতা ছক ২)। বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্টসমূহ ১৯৭৩-এর শেষনাগাদ চলাচল উপযোগী করা হয়; একই সময় রেললাইনগুলো চলাচল উপযোগী করা হয়; চট্টগ্রাম বন্দর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় ১৯৭৪ নাগাদ মাইনমুক্ত করা হয়; টেলিযোগাযোগব্যবস্থা সচল করা হয়। অর্থাৎ বিচক্ষণ ও প্রায়োগিক দক্ষতাসহ অর্থনীতির অবকাঠামোর বিকল অবস্থা অতি স্বল্প সময়েই কার্যকরভাবে সচল করা হয়। অথচ পশ্চিমা পণ্ডিতেরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন "বাংলাদেশ গড়ে তোলা অসম্ভব", "বাংলাদেশ সচল করতে কমপক্ষে দশ বছর সময় লাগবে"।

৫। মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিসহ শিক্ষাকার্যক্রম প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার অগ্রাধিকার ক্রমানুযায়ী যে কাজগুলি করলেন, তা হলো ১৯৭১-এর মার্চ-ডিসেম্বরকালীন ছাত্র বেতন মওকুফ এবং পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্বাধীন-মুক্ত-জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ সৃষ্টির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও তা বিনামূল্যে প্রদানের ঘোষণা (উভয়ই ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে); ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্মাণসামগ্রী সরবরাহ (অব্যাহত এ

কাজের শুরু ১৯৭২-এর মার্চ মাসে); প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ (১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে শুরু); বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান (১৯৭২-এর জুন মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় বাজেটে); এবং ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও শিক্ষকদের ৯ মাসের বেতন প্রদান (উভয়ই ১৯৭২-এর জুলাই মাসে)। এসবের বেশ কয়েকটি কর্মকাণ্ড চলমান থাকলো। এ তো গেল ১৯৭২ সালের কথা। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই দেশে দ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ৩৬ হাজার ১৬৫টি বেসরকারি স্কুল সরকারীকরণ-জাতীয়করণ এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করলেন। ফলে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৪২ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকৃত হলো। সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে জাতীয়করণ ছিল অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় শর্ত।

স্বাধীনতাত্তোরকালে বঙ্গবন্ধু যে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষাকে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বয়নে ও সমতাভিমুখী সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান হিসেবে দেখবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। বিজ্ঞানভিত্তিক-গণমুখী-কর্মমুখী-জীবনমুখী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট মাত্রায় গুরুত্ব প্রদান– এটা বঙ্গবন্ধুর দেশজ উন্নয়নদর্শনের (home grown development philosophy) অন্যতম প্রধান অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষাকে বঙ্গবন্ধু কখনও ব্যয় (expenditure) হিসেবে গণ্য করেননি, গণ্য করেছেন উন্নয়নে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ (investment) হিসেবে। আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্পষ্ট ধারণা প্রসঙ্গে যা বললাম, তার স্বপক্ষে উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশনে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একাংশের শিরোনাম ছিল "শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ"। ১৯৭০-এর ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন *"সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন। প্রতিবছর ১০ লক্ষেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকেরও বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ...জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের, **বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে**। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে।... দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে"*[১৩]। শিক্ষা যে মানুষের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা যে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ আর তাই শিক্ষাখাতে যথেষ্ট মাত্রায় বিনিয়োগ করতে হবে, শিক্ষাকে যে হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত, শিক্ষক বিশেষ করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের যেন উচ্চ মর্যাদায় দেখা হয়, দারিদ্র্য যেন শিক্ষার মাধ্যমে মেধা বিকাশে বাধা না হয়– বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার এসবের কোনোটিই রাজনৈতিক স্লোগানমাত্র ছিল না। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বঙ্গবন্ধু সরকারপ্রণীত ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট; বাংলাদেশের সংবিধান; মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে

[১৩] বঙ্গবন্ধুর ১৯৭০-এর নির্বাচনী ভাষণটির জন্য দেখুন: মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), বঙ্গবন্ধুর ভাষণ (১৯৮৯), ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন, পৃ: ৩০।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন (১৯৭৩ সাল); সেই সাথে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসহ প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ।

উল্লেখ্য, ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব ও সুপারিশসমূহসহ যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল, তার ভিত্তি-দর্শন হলো বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতি– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। আর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আলোকিত মানুষ-কারিগর সৃষ্টির মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

৬। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ জাতীয়করণ নীতি (Nationalisation Policy) ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে ব্যাংক (বিদেশি ছাড়া), বিমা (বিদেশি ছাড়া), পাট, বস্ত্র, কাগজ শিল্প, অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ-পরিবহন, বৃহৎ পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠান (১৫ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে), বিমান ও জাহাজ কর্পোরেশনকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ ছাড়াও সামন্তবাদ উচ্ছেদের লক্ষ্যে জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা বেঁধে দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিস্বত্ব সরকার গ্রহণ করে এবং সেগুলোর সমন্বয়ে মোট ৬টি ব্যাংক গঠিত হয়। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩ জানুয়ারি ১৯৭২-এ জারিকৃত ১নং আদেশ (AOP 1) এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ ঘোষিত ১৬নং আদেশ (PO 16)-এর আওতায় অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার ৮৫ শতাংশ শিল্পকারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত রাষ্ট্র এসবের মালিকানা ও দখল গ্রহণ করে। এসব পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত' হিসেবে অভিহিত হয়। উল্লেখ্য, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের PO 16 বিধি অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা ফেরত পাবার জন্য সরকার বরাবর আবেদনের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তবে এ আদেশে জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি ফেরত পাবার কোনো সুযোগ ছিল না।

৭। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন গ্রামীণ সমাজে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশের প্রতিটি গ্রামে গণমুখী সমবায় সমিতি গঠন করা হবে, যেখানে গরিব মানুষ যৌথভাবে উৎপাদনযন্ত্রের মালিক হবেন; যেখানে সমবায়ের সংহত শক্তি গরিব মানুষকে জোতদার-ধনী কৃষকের শোষণ থেকে মুক্তি দেবে; যেখানে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা গরিবের শ্রমের ফসল আর লুট করতে পারবে না; যেখানে শোষণ ও কোটারি স্বার্থ চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

মানুষের যৌথ উদ্যোগ-যৌথ চিন্তার প্রতিষ্ঠান সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারী চিন্তাসমৃদ্ধ ছিল তা লক্ষ করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যে, যেখানে তিনি বলছেন, *"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে–এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকেরা যৌথভাবে উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষী গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষীর শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের*

সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন, তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।...আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার। ...অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন– কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করছি যে সংস্থার পরিচালনা দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যাক্তির উপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলি যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে।...আমার প্রিয় কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে"। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, গরিব মানুষকে জোতদার-ধনীদের শোষণ থেকে মুক্তি, মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসসহ সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ ও গণতন্ত্র বিকশিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতভিত্তিক, পেশাভিত্তিক গণমুখী সমবায় আন্দোলন (pro-people co-operative movement) গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত বক্তব্যে স্ব-ব্যাখ্যায়িত।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৯৭২ সালে ঘোষিত গণমুখী সমবায় আন্দোলন সফল হয়নি। একদিকে বৃহৎ ভূ-স্বামী জোতদারদের জমি হারানোর ভীতিসহ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র, আর অন্যদিকে বিভিন্ন খাত-ক্ষেত্র- পেশাভিত্তিক বহুমুখী সমবায় গঠন ও পরিচালন কীভাবে হবে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব– এসবই গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়নি। সেই সাথে এ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যতটুকু সময় পাওয়া প্রয়োজন ছিল তাও পাওয়া যায়নি। বঙ্গবন্ধু তারপরও দমে যাননি। ১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানের (সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বললেন: *"...এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্লান-এ বাংলাদেশে ৬৫ হাজার গ্রাম-কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদের বিদায় দেয়া হবে তা*

না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে।... আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে। ... আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে"[১৪]। এখানে উল্লেখ জরুরি যে, বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়সহ বহুমুখী সমবায় গঠন নিয়ে বঙ্গবন্ধু যেদিন দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে এসব ঘোষণা দিলেন তার সাড়ে ৪ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো! এর কারণ–বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে এমন শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনসহ সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী বিবৃত করা হয়েছিল যা, থেকে সাম্রাজ্যবাদসহ তাদের দেশি-বিদেশি সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা চুপ করে বসে থাকা কোনো অর্থেই আর নিরাপদ মনে করেনি।

৮। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলায়' রূপান্তর ও 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর' লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শুধু পুনর্বাসন, পুনঃগঠন, পুনঃনির্মাণ কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) মাত্র আড়াই মাসের মধ্যেই (৩০ মার্চ ১৯৭২) দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, যার চেয়ারম্যান ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজে[১৫]। কমিশন মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে রচনা করলেন এক ধ্রুপদী দলিল–বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮), যার বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে। ধ্রুপদী এ দলিলের ভিত্তি-দর্শন হিসেবে কাজ করেছে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাসংশ্লিষ্ট বঙ্গবন্ধুর "স্বদেশের মাটিউত্থিত উন্নয়নদর্শন"–ধার করা কোনো উন্নয়নদর্শন নয়। উন্নয়নের এই ধ্রুপদী প্রথম-পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনা দলিলটি রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল ১৯৭২-এর সংবিধানের আদর্শিক মূলনীতিসমূহকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন বিষয়টি সঙ্গত কারণেই গুরুত্ব পেলেও মূল দিকনির্দেশনার বিষয় ছিল ভবিষ্যতের বাংলাদেশ–বৈষম্যহীন, জনকল্যাণকর, সমৃদ্ধ, উন্নত, প্রগতিবাদী এক আলোকিত বাংলাদেশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহে যা বলা হয়েছিল তার মধ্যে উন্নয়ন-প্রগতি অগ্রাধিকারে দিকনির্দেশনাসমূহের গুরুত্ববহ কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস। আর লক্ষ্যার্জনের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছিল: কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, এবং সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী আর্থিক ও দ্রব্যমূল্যসংশ্লিষ্ট নীতিমালা।

২. অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত কৃষি ও শিল্পের পুনঃগঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

---

১৪ বিস্তারিত দেখুন, মিজানুর রহমান মিজান (সম্পাদিত), ১৯৮৮, "বঙ্গবন্ধুর ভাষণ", ঢাকা: নভেল পাবলিকেশন্স, পৃ: ২১৪-২১৮

১৫ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে একত্রিত করা হলো দেশের স্বনামখ্যাত দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদদের। মন্ত্রী পদমর্যাদায় ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হলো ড. নুরুল ইসলামকে আর প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হলো অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেনকে।

৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বার্ষিক হার ৩ শতাংশ থেকে কমপক্ষে ৫.৫ শতাংশে উন্নীত করা। আর আনুষ্ঠানিক খাতসমূহে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ। মানবশক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকারকাঠামো শক্তিশালী করা।

৪. নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্যতেল, কেরোসিন, চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজারমূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা এবং কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা স্থিতিশীল রাখা।

৫. পুনর্বণ্টনমূলক আর্থিক নীতিকৌশলসহ বণ্টন নীতিমালা এমন করা যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার দেশের সামগ্রিক গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় (এবং উচ্চ আয়ের মানুষদের এক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে)।

৬. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা-দক্ষতার ভিত্তিতে নিরূপণ করা; অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জনকল্যাণকামী পরিবর্তন সাধন করা।

৭. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা– ৬২ শতাংশ থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭ শতাংশে কমিয়ে আনা। স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করা এবং আমদানিকাঠামো পুনঃবিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতাভিত্তিক অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।

৮. গ্রাম-শহরে স্ব-কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৯. কৃষির প্রতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা; খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

১০. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ণ, পানি সরবরাহ ইত্যাদি সামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে উন্নয়ন বরাদ্দের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সাধারণ সক্ষমতা ও কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল নিয়ে যা উল্লেখ করলাম, সেখানে অন্তত দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয় বলে মনে করি। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী উন্নয়নদর্শনটি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ-কৌশলসহ স্বাধীনতার চেতনা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তুও সে অনুযায়ী বিনির্মাণ করা হয়েছিল (সব সীমাবদ্ধতাসহ), যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাসনিমিত্ত শক্ত-ভিত্তির জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল রচিত হলো তা বাস্তবায়নের মাত্র দুই বছরের মধ্যে গভীর এক আন্তর্জাতিক-সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসহ ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ-জনকল্যাণকর-বৈষম্যহ্রাসকারী-প্রগতিবাদী বাংলাদেশ বিনির্মাণের বাস্তবসম্মত স্বপ্নকে পরিকল্পিতভাবে বিনষ্টের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হলো– ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে।

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক প্রয়োগ ও প্রয়োগফলের ধনাত্মক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রবণতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে যদি কোনোভাবে এমন কোনো হিসেব করা সম্ভব হয়, যেখানে "বঙ্গবন্ধুসহ আজকের বাংলাদেশের

অর্থনীতি ও সমাজের চেহারা কেমন হতে পারতো" এটা দেখানো যায় সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার গভীর ষড়যন্ত্রের কার্যকারণ সূত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল সমীকরণও হয়তো বা উন্মোচিত হয়ে যাবে। এ ধরনের জটিল গবেষণা একটু হলেও হয়েছে, যেখানে দেখানো সম্ভব হয়েছে যে যদি বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকতেন' এবং সেইসাথে জাতীয়তাবাদ-সমাজতন্ত্র-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতাসংশ্লিষ্ট চার-দর্শনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নপ্রবণতা বহাল থাকতো, তাহলে আজকের বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজের সম্ভাব্য চেহারাটি কেমন হতে পারতো? এক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নকাঠামো, প্রবৃদ্ধি হার এবং বৈষম্য বিমোচনমুখী উন্নয়ন কৌশল যদি বজায় থাকতো, তাহলে মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়সহ আর্থসামাজিক শ্রেণিবৈষম্য হ্রাসে যে পরিবর্তন ঘটতে পারতো, তা আজকের সময়ের বিচারে কল্পনাতীত এবং অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে[১৬]।

৪. "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—পূর্ণ বাস্তবায়নে সমাজ কাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তনটা কেমন হতো?

গবেষণায় ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে "বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে" এবং একই সাথে "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে অর্থনীতির প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডে বাংলাদেশ কল্পনাতীত মাত্রায় এগিয়ে যেত। যেমন প্রমাণিত হয়েছে যে ২০০০ সাল নাগাদ মালয়েশিয়াকে পেছনে ফেলে দিত বাংলাদেশ।[১৭] অর্থনীতির যেসব বড় মাপের মানদণ্ডে এসব ঘটত, তার মধ্যে আছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), (এমনকি) মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন, মোট জাতীয় আয়, মাথাপিছু জাতীয় আয়, মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় (পিপিপি ডলারে)।

'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর অনুষঙ্গ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে অর্থনীতিতে কল্পনাতীত পরিবর্তন হতো এ নিয়ে সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজকাঠামোর ধনাত্মক পরিবর্তন ঘটায়—এ কথা নিঃশর্ত সত্য নয়। আর সে কারণেই ভাবনাটা জরুরি যে, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সমাজে, সমাজকাঠামোতে, শ্রেণিকাঠামোতে সম্ভাব্য কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারতো। যা হয়নি। যাকে আমি বলছি "কল্পনাতীত হারানো সম্ভাবনা" বা "unimaginable lost possibilities"।

এককথায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের পরিবর্তিত শ্রেণিকাঠামোটি কেমন হতে পারতো? প্রশ্নটি সহজ কিন্তু উত্তর কঠিন। তবে সহজ এ প্রশ্নটি উত্থাপন এখন জরুরি; কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী বাংলাদেশে আয় ও ধনবৈষম্য ক্রমবর্ধমান। "বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে" এবং একইসাথে তাঁরই উদ্ভাবিত "সমাজ-অর্থনীতির উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে আমার হিসেবে সম্ভাব্য সামাজিক পরিবর্তন যা হতো তার কয়েকটি প্রবণতা-সম্ভাবনা নিম্নরূপ:

১) ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪৭ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সুনামগঞ্জের আব্দুল নূর, বীর প্রতীকের একমাত্র কন্যা (যার জন্ম ১৯৭১ সালে) হোসনে আরাকে রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটা বানিয়ে বিক্রি করে হাওড়ের জীর্ণ কুটিরে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হতো না। মুক্তিযোদ্ধা-সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা-মুক্তিযুদ্ধের সময় জীবন দিতে প্রস্তুত সহানুভূতিশীল মানুষদের দরিদ্র-বঞ্চিত-শোষিত-নিষ্পেষিত হতে হতো না। বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা ভ্যান চালান আর ভ্যানে বসে রাজাকার সিগারেট ফুঁকে বলে "এই ব্যাটা মুক্তিযোদ্ধা জোরে চালাতে পারিস না"—এ অবস্থা কখনও হতো না।

---

১৬ এ গবেষণা ফলাফলের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ, (পৃ: ১০৯-১৬০), ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

১৭ বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত (২০১৫), বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ। (পৃ: ১০৯-১৩৭); ঢাকা: মুক্তিবুদ্ধি প্রকাশনা।

২) মহান মুক্তিযুদ্ধে ইজ্জতহানি-সম্ভ্রমহানির শিকার ১০ লক্ষ নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় সমাজে বসবাসের সকল সুযোগ সৃষ্টি করা হতো।

৩) ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়িত হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক-মানবিক-চেতনায়ন বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে মানবমুক্তি ও স্বাধীনতা চেতনাসংশ্লিষ্ট বোধ বৃদ্ধি পেত এবং তা কার্যকরভাবে দেশ-সমাজ গঠনে নিয়ামক ভূমিকা রাখত। এসবের ধনাত্মক প্রতিফল হতো অনেক গভীর-বহুমুখী-বহুবিস্তৃত। এবং বংশপরম্পরা।

৪) সংবিধানের ১১, ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় শাসন (local governance) উৎসাহিত হতো এবং ঐসকল প্রতিষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক এবং নারীরা যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করতেন; নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনভার অর্পণ করা হতো এবং স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান স্থানীয় প্রয়োজনে করারোপসহ বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতো। এসবের প্রকৃত অভিঘাত যা দাঁড়াতো তা হলো জনগণই হতেন প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত মালিক এবং দেশের উন্নয়ন ও প্রগতি কর্মকাণ্ডে দেশের সাধারণ মানুষের অভিপ্রায়ই নিয়ামক ভূমিকা পালন করতো। আর এর ফলে একদিকে যেমন উন্নয়নে জনগণের প্রকৃত অংশীদারিত্ব বাড়ত অন্যদিকে দুর্নীতি-লুণ্ঠন-পরজীবী প্রকৃতির উন্নয়ন-প্রগতিবিরোধী কর্মকাণ্ড উচ্ছেদ হয়ে যেত। "মানুষ নিজেই নিজের ইতিহাস রচনা করতেন"–এটাই ছিল "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর নিহিতার্থ।

৫) মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সবার জন্য সবধরনের চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান হেতু স্থূল জন্মহার (crude birth rate) এবং স্থূল মৃত্যুহার (crude death rate)– উভয়ই হ্রাস পেত। এসবের ফলে দারিদ্র্য-উদ্ভূত মৃত্যুহার বহুগুণ হ্রাস পেত। জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস পেলেও আজকের জনসংখ্যা হয়তো বা ১৭ কোটিতেই থাকত কিন্তু জনসংখ্যায় বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন ঘটত। যা হতো তা হলো এই ১৭ কোটি জন-সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে উচ্চতর গুণমানসমৃদ্ধ আলোকিত জন-সম্পদে রূপান্তরিত হতো ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত মানে আমূল পরিবর্তন আসত। আর এই রূপান্তর দেশজ মেধা-মননের বিকাশসহ দেশজ উৎপাদন-পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার চেহারাটাই পাল্টে দিত (অন্তত শ্রমের অধিকতর ফলপ্রদতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে)। এসবের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিফল হতো আজকের বাংলাদেশের তুলনায় অন্য এক বাংলাদেশ বিনির্মিত হয়ে যেত– যে বাংলাদেশকেই বঙ্গবন্ধু 'সোনার বাংলা' নামে আখ্যায়িত করতেন।

৬) জনসংখ্যা ১৭ কোটি থাকত তবে মোট জনসংখ্যায় গ্রামের জনসংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেত। গ্রাম তো আর আজকের মতো গ্রাম থাকত না। গ্রামের মানুষ নগরের নাগরিকসমাজের সকল সুবিধা গ্রামে বসেই পেতেন– পেতেন বিদ্যুৎ, পেতেন জ্বালানি সুবিধা, পেতেন সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালির বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক সুবিধাদি, পেতেন বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষার সুযোগ, পেতেন আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, পেতেন আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ গণযোগাযোগ ও ব্যক্তি যোগাযোগের সকল মাধ্যমে সহজ অভিগম্যতা (অর্থাৎ যাকে বলে PSURA, providing scientific urban amenities in rural areas)। এসবের ফল দাঁড়াত একদিকে গ্রামের মানুষের সুস্থ আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লম্ফন। আর অন্যদিকে আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ এখন গ্রামে বাস করেন, যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ (যেখানে ১৯৭০

সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যায় গ্রামীণ জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৯২ শতাংশ একই সময়ে মালয়েশিয়ায় তা ছিল ৬৭.৩ শতাংশ)। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে গ্রামের চিত্র আমূল পাল্টে যেত–সংজ্ঞাগতভাবেই গ্রামকে আর প্রচলিত অর্থের গ্রাম বলা যেত না এবং গ্রাম-শহরের জনসংখ্যার এখন যে অনুপাতটা আছে (৭২:২৮) অর্থাৎ মোট ১৬ কোটি মানুষের ৭২ শতাংশ গ্রামে বাস করেন, আর বাকি ২৮ শতাংশ শহরে বাস করেন; সেটা ঠিক উল্টো হতো অর্থাৎ জনসংখ্যায় গ্রাম-শহরের অনুপাতটা হতো ২৮:৭২–এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে আজকের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে গ্রাম থেকে শহরে যে গলাধাক্কা অভিবাসন হচ্ছে এবং সেই সাথে গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসিত এই মানুষ অনানুষ্ঠানিক খাতে স্বল্প মজুরিতে কাজ করে প্রথমে দরিদ্র থেকে নিঃস্ব হচ্ছেন আর তারপরে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন– এই প্রক্রিয়া থাকত না; কারণ গ্রাম থেকে মানুষ কোনো কারণে শহরে এলেও সে মানুষ অপেক্ষাকৃত জ্ঞানসমৃদ্ধ সুস্থ-সবল দক্ষ-প্রশিক্ষিত আলোকিত মানুষ হিসেবে নিদেনপক্ষে শিল্পায়নের আওতায় থাকতেন এবং উচ্চতর জীবনমানের অধিকারী হতেন।

৭) বৈষম্য হ্রাস-উদ্দিষ্ট ও গ্রাম-শহরের প্রভেদ দূরীকরণনিমিত্ত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসহ (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৬) বঙ্গবন্ধু ঘোষিত (১৯৭৫ সালে) গণমুখী সমবায় আন্দোলন (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রামীণ সমবায়, কৃষক সমবায়, তাঁতী সমবায়সহ ১৯৭২-এর সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গুরুত্বক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানার ধরনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরেই সমবায়ী মালিকানার প্রতিশ্রুতি) ও কলকারখানায় শ্রমিকের যৌথমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে থাকত না কোনো ভূমিহীন কৃষক, থাকত না জল-জলায় মালিকানাহীন প্রকৃত দরিদ্র কোনো জেলে, থাকত না দরিদ্র কোনো মেহনতি শ্রমিক।

৮) বহুমুখী-বহুরূপী দারিদ্র্যের অনেকগুলোর কোনো অস্তিত্বই থাকত না, দারিদ্র্যের কিছু কিছু রূপ প্রশমিত হতো এবং আস্তে আস্তে সেগুলোও বিলুপ্ত হতো। বহুমুখী দারিদ্র্যের এসব রূপের মধ্যে আছে আয়ের দারিদ্র্য, ক্ষুধার দারিদ্র্য, কর্মহীনতার দারিদ্র্য, স্বল্প মজুরির দারিদ্র্য, আবাসনের দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যের দারিদ্র্য, অস্বচ্ছতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, শিশুদারিদ্র্য, প্রবীণ মানুষের দারিদ্র্য, নারীপ্রধান খানার দারিদ্র্য, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকের দারিদ্র্য, ভাসমান মানুষের দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধী মানুষের দারিদ্র্য, 'মঙ্গা' এলাকার মানুষের দারিদ্র্য, বহিঃস্থ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য, বস্তিবাসী ও স্বল্প আয়ের মানুষের দারিদ্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিপর্যয়ের দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য, প্রান্তিকতা থেকে উদ্ভূত দারিদ্র্য (অনানুষ্ঠানিক সেক্টর, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী মানুষ, নিম্নবর্ণ-দলিত, 'পশ্চাৎপদ' পেশা, চর-হাওর-বাঁওড়ের মানুষ), রাজনৈতিক দারিদ্র্য (রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ না করতে পারার কারণে দারিদ্র্য), রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনাকারীদের প্রতি আস্থাহীনতা-উদ্ভূত দারিদ্র্য ইত্যাদি[১৮]।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে যেসব প্রবণতা-সম্ভাবনা এতক্ষণ উল্লেখ করলাম সবকিছুই মোটামুটি তেমনটিই হতো—কারণ এ সম্ভাবনা বাস্তব, কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। আর সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটাই সম্পূর্ণ বদলে যেত। শ্রেণিসমাজের রূপান্তর

[১৮] দারিদ্র্যের বহুরূপ-বহুমুখ এবং সংশ্লিষ্ট কারণ-পরিণামসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা দূরীকরণে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৭, "বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে", (পৃ: ৩৫-৬৯); ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

ঘটত এ কারণেও যে ১৯৭২-এর সংবিধানের চার মূল স্তম্ভে ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক মানুষে-মানুষে বৈষম্য হ্রাসসহ সমজাতীয় বিষয়াদি নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি।

আজকের বাংলাদেশে আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটি কেমন আর কেমনটা হতো ঐ শ্রেণিকাঠামো যদি বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হতো (বঙ্গবন্ধু 'যদি বেঁচে থাকতেন')? এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তাসহ হিসেবপত্তর কেউ কখনও করেছেন বলে আমার জানা নেই। এ নিয়ে আমার হিসেবপত্তরভিত্তিক বর্তমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন কার্যকরীভাবে বাস্তবায়িত হলে ঐ কাঠামো কেমন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের হতো[১৯] তা যথাক্রমে ছক ৩ ও ছক ৪-এ দেখানো হয়েছে।

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোটি অতিমাত্রায় শ্রেণিভিত্তিক এবং চরম বৈষম্যমূলক। শুধু তা-ই নয় এ শ্রেণিবৈষম্য ক্রমবর্ধমান। দেশে ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্য ও আয়বৈষম্য নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর বিকাশপ্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আমাদের সার্বিক বহুমুখী দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতার অধোগতি হচ্ছে[২০]। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্রমুখী আর সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে কিছু ধনিক শ্রেণির মানুষের হাতে, যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আর এদেরই মধ্যে ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের মোট বিত্তের ৯০ শতাংশ বিত্ত-সম্পদ (অর্থাৎ এরা হলো দেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো মইয়ের উপরের ১ শতাংশ মানুষ, যাদের বলা হয় super-duper elite)। অর্থাৎ এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে জনসংখ্যার অত্যুচ্চ ১ শতাংশের এক সমীকরণ, যাকে নোবেল বিজয়ী অথনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ আখ্যায়িত করেছেন "Of the 1%, for the 1%, by the 1%" হিসেবে, এমনকি পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় সর্বোচ্চ ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে সর্বোচ্চ বিত্তশালী ১ শতাংশ আমেরিকান তাদের দেশের মোট বিত্ত-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মালিক; যেখানে ক্রমবর্ধমান অসমতা (inequality) এবং সুযোগের অভাবহেতু (lack of opportunity) ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, আর গরিবরা হচ্ছে আরও গরিব[২১]।

---

১৯ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর শ্রেণিভিত্তিক আমার হিসেবপত্তর নিয়ে যে-কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন। মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা সবারই আছে। তবে ভিন্নমত অথবা দ্বিমত পোষণকারীদের এ বিতর্কে অবতীর্ণ হবার আগে অনুরোধ করব এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যে, তারা বিশ্বাস করেন কি না যে ১৯৭২-এর সংবিধানে প্রতিশ্রুত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত, তারাই দরিদ্র। আর একই সাথে অনুরোধ করব মানেন কি না যে দারিদ্র্যের বহুরূপ আছে, দারিদ্র্য বহুমুখী (যেসব রূপের কথা উপরে '৮'-এ উল্লেখ করেছি)। এসব রূপের যেকোনো একটি বা একাধিক রূপ, যার জন্য প্রযোজ্য তিনিই 'বহুমুখী দরিদ্র', আর তার জীবনের অবস্থাটাই দারিদ্র্য।

২০ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান শ্রেণি বৈষম্যসহ দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৭, বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। মইনুল ইসলাম (২০১৯), "বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য: সমাধান কোন পথে?" বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, জাতীয় সেমিনার, ঢাকা: ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

২১ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন জোসেফ স্টিগলিজ, (২০১৩), The Price of Inequality, Penguin Books, পৃ: ix, xi, xiii, xxix-xxxii, xlii-xliii, xliv-xlvii, 1-3, 5, 19, 35,-38; পল ক্রুগম্যান, (২০১৩), End This Depression Now, WW. Norton & Company Ltd., পৃ: ৭৪-৮২; নোয়াম চমস্কি, (২০০৪), Hegemony or Survival : America's Quest for Global Dominance, Penguin Books, পৃ: ১৫৯; চাক কলিন্স. (২০১২). 99 To 1: How Wealth Inequality is Wrecking the World and What We Can Do About It. পৃ: ৩, ১৯-৩১, ৪১-৪৭.

ছক ৩: আজকের (২০২২ সালের) বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো কেমন? (মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি)

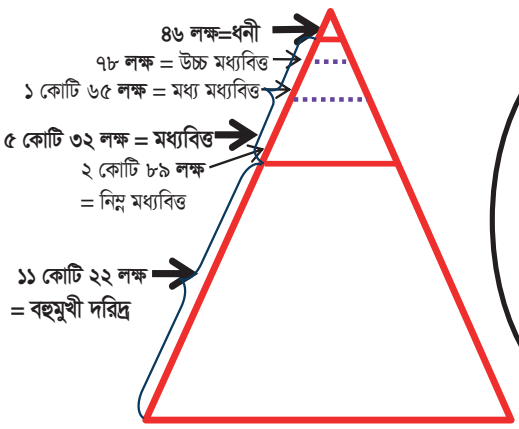

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত।

ছক ৪: 'বঙ্গবন্ধুসহ' আজকের (২০২২ সালের) বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো কেমন হতো? (মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি)

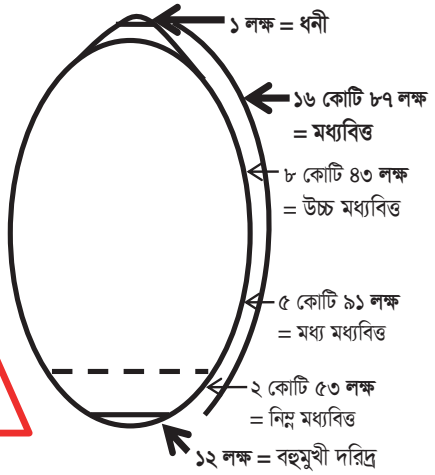

'বঙ্গবন্ধুহীন' আজকের ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা নিম্নরূপ (ছক ৩ দেখুন): মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ (অর্থাৎ ৪৬ লক্ষ) মানুষ ধনী আর ১ শতাংশ হবে, যাকে বলে সুপার-ডুপার ধনী; ৩১.৩ শতাংশ মধ্যবিত্ত (মোট ৫ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষ); আর ৬৬ শতাংশ বহুমুখী দরিদ্র (multiple poor, যাদের সংখ্যা ১১ কোটি ২২ লক্ষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশ সুস্পষ্টভাবে ধনী-দরিদ্রে বিভাজিত। আর আর্থসামাজিক শ্রেণিমইয়ের অত্যুচ্চ স্থানে অবস্থিত মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ অত্যুচ্চ ধনীই শুধু নয়, তারা rent seeking-এর বিভিন্ন পথ-পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করে ফেলেছে। এরা মোট জাতীয় পারিবারিক সম্পদ ও আয়ের (কালোটাকাসহ) ৬০-৭০ শতাংশের মালিক। আর তার বিপরীতে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য (যা বহুমুখী) বেড়েছে ও ক্রমাগত বাড়ছে। 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণি-সমীকরণটা দাঁড়িয়েছে এমন যে লুটেরা দুর্বৃত্ত, পরজীবী, অনুপার্জিত আয়কারী, অন্যের সম্পদ হরণকারী-আত্মসাৎকারী, ফাওখাওয়া এই rent-seeker গোষ্ঠী সমগ্র আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে তাদের অধীনস্থ করার ফলে বাস্তব উন্নয়ন নীতি-দর্শনটাই এমন যে ধনী আরও ধনী হবে, মধ্যবিত্তের অধোগতি হবে, এবং দরিদ্র মানুষ দরিদ্রতর হয়ে নিঃস্ব হবেন আর তার পরে হবেন ভিক্ষুক (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে)। এসবই 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামো রূপান্তরের মূলকথা।

লেখচিত্র ১: 'বঙ্গবন্ধুহীন' ও 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণির তুলনামূলক অবস্থা:
দু'অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত মোট ১৭ কোটি মানুষের শতকরা হার, ২০২২

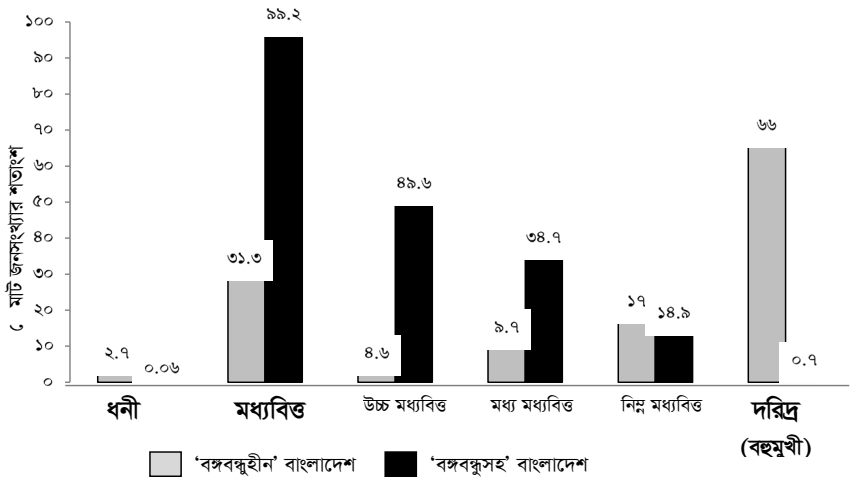

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও বৈষম্য হ্রাসকরণ-উদ্দিষ্ট উন্নয়নদর্শন" কার্যকর হলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোটা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ও প্রগতিবাদী হতো—এতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়িত হলে আজকের ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশের আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন-রূপান্তর ঘটে যেমনটি দাঁড়াত, তা নিম্নরূপ (দেখুন ছক ৪, আর তুলনামূলক অবস্থার জন্য লেখচিত্র ১ দেখুন): আজকের বাংলাদেশে মোট ১৭ কোটি জনসংখ্যার যেখানে ২.৭ শতাংশ ধনী, সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে কমে দাঁড়াত ০.০৬ শতাংশ (অর্থাৎ আজকের ৪৬ লক্ষের বিপরীতে মাত্র ১ লক্ষ মানুষ); শ্রেণিকাঠামোর একদম নিচতলার বহুমুখী দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আজকে যেখানে মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ (মোট ১১ কোটি ২২ লক্ষ মানুষ), সেটা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে (আজকের দৃষ্টিতে-এই সময়ে বসে) কল্পনাতীত হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশে দাঁড়াত (অর্থাৎ দরিদ্র মানুষের সংখ্যা হতো মাত্র ১২ লক্ষ); সেইসাথে সংখ্যাগত ও গুণগত দিক থেকে সবচে বড় যে পরিবর্তন ঘটত, সেটা হলো—মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে পরিবর্তন রূপান্তর–আজকে মোট জনসংখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা ৩১.৩ শতাংশ (মোট ৫ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষ), যা 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে প্রায় তিনগুণ বেড়ে মোট জনসংখ্যার ৯৯.২ শতাংশে উন্নীত হতো (অর্থাৎ মোট মধ্যবিত্তের সংখ্যা হতো ১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ মানুষ)। অর্থাৎ 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আজকের বাংলাদেশের তুলনায় একদিকে ধনী মানুষের মোট সংখ্যা ৪৬ গুণ কমে যেত, অন্যদিকে বহুমুখী দরিদ্র মানুষের মোটসংখ্যা প্রায় ৯৪ গুণ কমে যেত, আর মধ্যবিত্ত মানুষের মোটসংখ্যা ৩.২ গুণ বাড়ত।

'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বহুগুণ হ্রাসের ফলে মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। কিন্তু মধ্যবিত্তে ঘটত বড় ধরনের কাঠামোগত রূপান্তর। মধ্যবিত্তের মধ্যে যে তিনভাগ আছে অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্য-মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এখানেই ঘটত

আমূল কাঠামোগত রূপান্তর। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের তুলনায় উচ্চ মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ১০.৮ গুণ (আজকের বাংলাদেশের ৭৮ লক্ষ থেকে বেড়ে 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ মানুষে উন্নীত হতো), মধ্য-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত ৩.৬ গুণ (মোট ১ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে বেড়ে ৫ কোটি ৯১ লক্ষ মানুষ), আর সঙ্গত কারণেই মধ্যবিত্তের উপরতলায় এত বৃদ্ধির ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে মানুষের সংখ্যা আজকের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ হ্রাস পেত (মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ থেকে কমে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ মানুষে দাঁড়াত)। অর্থাৎ এককথায় বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিবাদী আমূল রূপান্তর ঘটত–এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বাংলাদেশের বিপরীতে এখন থেকে ৫০ বছর আগের বাংলাদেশের সমকক্ষীয় বেশকিছু দেশ অথনৈতিকভাবে বেশ উন্নতি করেছে, এ কথা সত্য তবে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিকাঠামোতে ঐসব দেশে তেমন কোনো প্রগতিমুখী রূপান্তর ঘটেনি, যা বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' বাংলাদেশে অবশ্যম্ভাবীভাবেই ঘটত। আর তা ঘটত "বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়নের কারণেই, অন্য কোনো অলৌকিক কারণে নয়।

বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' এবং বঙ্গবন্ধুর উন্নয়নদর্শন বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিসহ সমাজের শ্রেণিকাঠামোতে যে আমূল প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটত সে বিষয়ে নিশ্চিত উপসংহারে উপনীত হবার আগে আরও কিছু বিশ্লেষণাত্মক বিষয়াদি উল্লেখ জরুরি। 'বঙ্গবন্ধুসহ' বাংলাদেশে আর্থসামাজিক শ্রেণিকাঠামোর প্রগতিশীল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্দেশকারী আরও কয়েকটি বিষয় নিম্নরূপ:

১. জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর মালিকানাকাঠামোটি সংবিধানিকভাবেই গুরুত্বক্রম অনুসারে যথাক্রমে 'রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী, ও (নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ব্যক্তিগত হবে'–প্রতিশ্রুতির কারণে সম্পদের সবচে বেশি অংশের মালিক হতো রাষ্ট্র, তারপর সমবায়[২২]। তারপরেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তি। আর এ কারণেই জাতীয় সম্পদের ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর ব্যক্তি-খানা-পরিবার (individual-household-family) পর্যায়ে মালিকানাজনিত তেমন কোনো বৈষম্য থাকত না।

২. ব্যক্তি-খানা-পরিবার পর্যায়ে জাতীয় সম্পদের যে অংশটুকু থাকত, তা বণ্টন বৈষম্য হ্রাস নীতি অথবা বণ্টন ন্যায্যতার নীতির কারণে শ্রেণিকাঠামো মইয়ের উপরের দিকে পুঞ্জীভূত হবার কোনো

---

[২২] আমার কাছে সংবিধানে বিধৃত এই সমবায়ের অর্থ অধুনা তথাকথিত 'অংশগ্রহণমূলক' (partnership) উন্নয়ন বলতে যা বুঝানো হয় তা নয়। তথাকথিত "অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন" আসলে নয়া-উদারবাদীদের প্রেসক্রিপশন। এক্ষেত্রে যা বুঝানো হয় তাতে আমি বুঝি সম্পদ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়তেই থাকবে আর তারই মধ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মেহনতি মানুষ অধিক হারে সম্পৃক্ত হবেন বা অংশগ্রহণ করবেন। আমার কাছে এই 'অংশগ্রহণের' অর্থ "শ্রমিক-কৃষক আরও বেশি কাজ করো, আরো বেশি উৎপাদন করো। আর আমরা মালিকরা যত বেশি পাবো তার অংশ তো চুইয়ে তোমাদের কাছেই যাবে– trickle down হবে। তোমরা আগের চেয়ে ভাল থাকবে। মজুরির আন্দোলন করে অযথা ঝামেলা বাড়িও না। কারখানা বন্ধ হলে তোমাদের কাজ থাকবে না। আর তাতে দেশের মহাক্ষতি হয়ে যাবে"। এই সম্পৃক্ততার বা অংশগ্রহণের মানে দাঁড়ায় উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের যন্ত্র-হাতিয়ারের উপর যেমন চাষের জমির উপর প্রকৃত কৃষকের থাকবে বড়জোর অভিগম্যতা (access) মালিকানা (ownership) নয়। এসবই হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিকে জিইয়ে রাখার জন্য নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিবিদদের এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি (intellectual fraud) যার পেছনে আছে সমাজতন্ত্রসহ অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ ঠেকানোর প্রচেষ্টা আর অন্য দিকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের দর্শন এবং যার বাস্তবায়ন দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদেরই প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক ও নীতি-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান যেমন বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডাবলু টি ও), আফ্রিকান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংকসহ জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন অংগ প্রতিষ্ঠান, এবং ইদানীংকালের বহু ধরনের 'থিংক ট্যাংক' (Think Tank, মহাচিন্তা-মহাদুশ্চিন্তার ল্যাবরেটরি) কে।

সুযোগই থাকত না। যেমন ঐ শ্রেণি মইয়ের (class ladder) উপরের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে থাকত উক্ত সম্পদ ও আয়ের বড়জোর ১৫ শতাংশ (যা এখন ৭০-৮০ শতাংশ) আর শ্রেণিমইয়ের সর্বনিম্ন ১০ শতাংশের হাতে থাকত উক্ত সম্পদ ও আয়ের ৭-৮ শতাংশ। একই সাথে উল্লিখিত মোট জাতীয় সম্পদ ও খানার আয়ের ৭৭-৭৮ শতাংশ থাকত ৮০ শতাংশ ব্যক্তি-খানা-পরিবারের হাতে। জাতীয় খানাভিত্তিক আয়ের চেহারাটাও আমূল পাল্টে অনুরূপ হতো। সুতরাং জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-খানা-পরিবারভিত্তিক তেমন কোনো বৈষম্য থাকত না বললে অত্যুক্তি হবে না।

৩. জন্মসূত্রে মানুষের দরিদ্র হবার কোনো সুযোগ থাকত না। বংশপরম্পরা দারিদ্র্য বলতে কিছু থাকত না। দরিদ্র হিসেবে যারা থাকতেন (মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.৭ শতাংশ) তার কারণ হতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অতিবৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, নদীভাঙ্গন, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) এবং ব্যক্তিগত (শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি) কারণে সৃষ্ট অস্থায়ী-স্বল্পকালীন-আপৎকালীন (temporary) দরিদ্র অথবা অদরিদ্রের কিছু সময়ের জন্য দরিদ্র হওয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর "মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণভিত্তিক বৈষম্যহ্রাসকারী অর্থনৈতিক নীতি-দর্শন" আর একই সাথে শক্তিশালী ও কার্যকর সামাজিক সুরক্ষা (strong and efficient social protection system) নীতি-কৌশল অবলম্বনের ফলে স্থায়ীভাবে কারও দরিদ্র থাকার কোনো সুযোগই থাকত না। এবং এটা জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ-বয়স-পেশানির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হতো। এসবই "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর মর্মবস্তু।

৫. উপসংহার

"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজভাবনা, রাজনীতিচিন্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নভাবনার পরস্পরসম্পর্কিত এক সমগ্রক রূপ। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর মৌল ভিত্তি চেতনা হলো জনগণের অন্তর্নিহিত অপার শক্তি ও অসীম ক্ষমতার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। এ দর্শন বৈষম্যহীন অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের সমৃদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে সহায়ক। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর প্রারম্ভিক বাস্তব প্রয়োগ হয় ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে, যার ইতিবাচক অভিঘাত ছিল দৃশ্যমান। "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ হয়নি; বাধাগ্রস্ত হয় ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যে দিয়ে। তবে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ-বাস্তবায়ন হলে ২০০০ সাল নাগাদ স্বাধীন বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত শ্রেণিবৈষম্যহীন শক্তিশালী অর্থনীতিসমৃদ্ধ ও আলোকিত মানুষের সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত হতো। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে "বঙ্গবন্ধু-দর্শন" বাস্তবায়নের অনুকূল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোকেই হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সমগ্র কাঠামোটিই ছিল প্রতিকূল। বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তীকালের কাঠামো নিও-লিবারেল মুক্তবাজার দর্শনভিত্তিক পরজীবী-লুটেরা পুঁজিবাদ (rent seeking capitalism) বিকশিত হবার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্যও ছিল তাইই—শোষিতের গণতন্ত্রভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণের কাঠামো ভেঙ্গেচুরে শোষণভিত্তিক লুটেরা-পরজীবী ধনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা, যে কাঠামোতে দেশের মোট উৎপাদন বাড়তে পারে—কিন্তু আয়বৈষম্য, ধনবৈষম্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য বাড়বেই।

এহেন ঐতিহাসিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন প্রশ্ন—"বঙ্গবন্ধু-দর্শন"-এর অনুষঙ্গ "বৈষম্যহ্রাসকারী উন্নয়নদর্শন" বাস্তবায়ন সম্ভব কি? আমার মতে, পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবে চলমান কাঠামোতেই কয়েকটি সম্ভাবনা পরীক্ষা-নীরিক্ষা-প্রয়োগ করে ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে আমি অন্তত তিনটি বড় মাপের ক্ষেত্র দেখি, যেখানে ঐ সম্ভাবনা প্রয়োগ করে দেখা সমীচীন: (১) রাষ্ট্রীয় আয়োজনে সারা দেশে উচ্চতর গুণগত মানসম্পন্ন বিজ্ঞানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার, যেখানে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনভাতাসহ সামাজিক মর্যাদা হতে হবে সর্বোচ্চ যাতে মেধাবিরা প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট হন। (২) রাষ্ট্রীয় আয়োজনে দেশের সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। অসংক্রামক ব্যাধি যেমন ক্যান্সার, হার্টের অসুখ, কিডনির অসুখ, ডায়াবেটিস—এসব রোগে প্রতিবছর আমাদের দেশে কমপক্ষে ৫০ লক্ষ অদরিদ্র মানুষ দরিদ্র হন। অসংক্রামক রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা হতে হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে—রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে (অন্তত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য)। (৩) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বহুমুখী-গণমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলা (এক্ষেত্রে খাসজমি-জলা সমবায়ী মালিকানায় দেয়া যেতে পারে)। আমার ধারণা বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামোতে অন্তত উল্লিখিত ৩টি পদক্ষেপ-কর্মকাণ্ড গ্রহণ সম্ভব, যা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য কমবে। কমবে ধনবৈষম্য, আয়বৈষম্য, স্বাস্থ্যবৈষম্য ও শিক্ষাবৈষম্য। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটাও হতে পারে 'বঙ্গবন্ধু-দর্শন'-এর আংশিক প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের দেশে মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ফলপ্রদ পথ-পদ্ধতি।